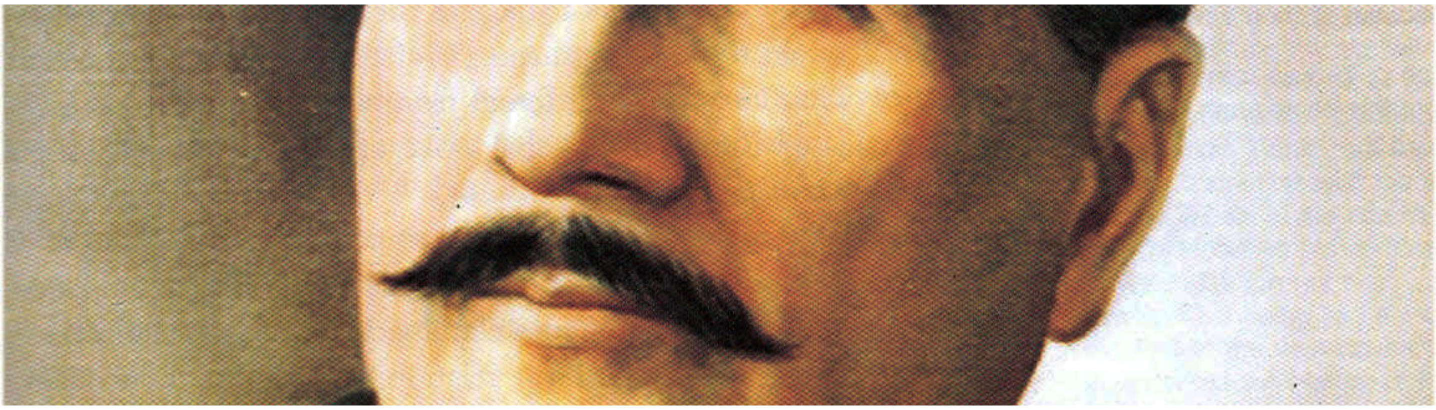

ইকবাল

জাবিদ ইকবাল

আমার জন্মের দুবছর আগে আমার আব্বা ষোড়শ শতকের সুফী সাধক সরহিন্দের শেখ আহমদের মাজার জিয়ারত করে একটি পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেনঃ তাঁর স্বপ্ন ছিল, সেই ছেলেকে তিনি ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী গড়ে তুলবেন। শেখ আহমদ সরহিন্দের কথা অনেকেই জানেন। এই সাধকশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ-ই-আলফ্-ই-সানী নামেও পরিচিত। ইনি ইবনুল আরবীর ওয়াহদাতুল ওজুদ তত্ত্বের বিরোধিতা করেন, সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতির সমালোচনা করেন এবং উনাকে পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তার অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। আব্বা দরবেশের কাছে ওয়াদা করে এসেছিলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে পুত্র সন্তান দান করেন তাহলে তিনি তাকে তাঁর মাজারে নিয়ে আসবেন।

তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল এবং যখন আমার কিছুটা বয়স হয়েছে, তখন তিনি আমাকে সরহিন্দে নিয়ে গিয়েছিলেন। শেখ আহমদের মাজার আমার মনের উপরে এতটা গভীর রেখাপাত করেছিল যে, সেদিনের কথা আমি আজও মনে করতে পারি। আব্বা আমাকে মাজারের ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরবেশের কবরের কাছে বসে কোরআন শরীফ পড়েছিলেন। অন্ধকারে কবরখানার পরিবেশে আমার ভয় ও আতঙ্ক বোধ হচ্ছিল, কিন্তু তবু আমার মনে সেই নিঃশব্দ-নির্জন পরিবেশের সঙ্গে কেমন একটা অদ্ভুত পরিচয়ের ভাব জাগছিল। আমি আব্বার কোরআন শরীফ পড়া লক্ষ্য করছিলাম। মাজারের অন্ধকার খিলানের ভেতরে তাঁর কণ্ঠের করুণ গম্ভীর ধ্বনি গুমরে ফিরছিল এবং অশ্রু ঝরছিল তাঁর দুই কপোল বেয়ে।

সরহিন্দের মাজারে একদিন কি দুইদিন থাকার পর আমরা লাহোরে ফিরে এসেছিলাম, কিন্তু আমাদের মাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি, আর আব্বার দুচোখে পানিই বা ঝরেছিল কেন, তার মর্ম আমি কখনই ভেদ করতে পারিনি। আমার এখনো মনে পড়ে, ছোটবেলায় এই প্রশ্নগুলো বারবার আমার মনে দোলা দিত।

আমার উপরে আব্বার স্নেহ-ভালবাসা কতখানি ছিল, সেটা বিচার করবার অবকাশ তিনি আমাকে খুব কমই দিতেন। আমাকে তিনি কদাচিৎ কাছে নিতেন বা চুমু দিতেন। তাঁর ভাব-ভঙ্গি থেকে সত্যিই কখনো আমি পিতৃস্নেহের গভীরতা বুঝতে পারিনি। উপর থেকে দেখে তাঁকে গম্ভীর এবং খানিকটা নির্লিপ্ত মানুষ বলেই মনে হতো। আমাকে বাড়িতে ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেখতে পেলে তিনি এমনভাবে একটা ফিকে হাসি হাসতেন, দেখে মনে হতো যেন কেউ তাঁকে ঐটুকু হাসতে বাধ্য করেছে। বরং প্রায়ই দেখতাম তিনি একাকী একটা ইজি চেয়ারে বসে আছেন, চোখ দুটো বোজা, আপন চিন্তায় নিমগ্ন।

সে যা-ই হোক, এটা মনে করলে ভুল হবে যে, তিনি ভালোবাসতে বা স্নেহ করতে পারতেন না। আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় তরুণসুলভ উদ্দীপনা না থাকলেও এতে তাঁর নিজস্ব একটা গভীরতা ও অনন্যতা ছিল। আমি যেন কেবল তাঁর পুত্রই ছিলাম না বরং ইসলামের তরুণ বংশধারারই মূর্তিমান প্রতীক ছিলাম- আর তাঁর আজকের এই সিংহ-শিশুদের এভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তিনি যে জগতে বাস করেন তার মৃত উষরতার তারা সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে পারে, প্রাণসঞ্চারী সাড়া জাগাতে পারে তাতে; যাতে তারা তাঁর কালকের দুনিয়ার শক্তিমান সিংহ হিসেবে গড়ে উঠে যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন তিনি সব সময়ই দেখতেন, যার জন্য আশা আর আকাঙ্ক্ষা তাঁর দীর্ঘ হিম-রাত্রির ঘুমকে ব্যাহত করতো এবং প্রতি প্রভাতের পটভূমিকায় তাঁকে উপস্থিত করতো। এক অচেনা আগন্তুক হিসেবে তাকে চিনে নিতে পারে।

ছেলেমেয়েদের কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তা নিয়ে মাঝে মাঝে বাপ-মার মধ্যে মতদ্বৈত হয়। এ জন্য আমি প্রায়শঃ আব্বা-আম্মার মধ্যে মতদ্বৈতের কারণ হতাম। আম্মা মনে করতেন যে, তিনি নিজ হাতে তুলে না খাওয়ানো পর্যন্ত আমার ঠিকমতো খাওয়াই হতো না। আর আব্বা মনে করতেন যে, এই করে তিনি আমাকে নষ্ট করে ফেলছেন। তাঁর বরাবর হুকুম ছিল সব সময় আমাকে নিজে নিজেই খেতে হবে। এইসব হুকুম অবশ্য প্রতিপালিত হতো; কিন্তু কখনো কখনো আম্মা আমাকে চুপে চুপে খাইয়ে দিতেন; আর আব্বা যদি কখনো আমাদের এইসব ছোটখাট ষড়যন্ত্র ধরে ফেলতেন তাহলে তিনি এমনভাবে মৃদু হাসতেন, দেখে মনে হতো যেন তিনি সবই জানেন।

> আম্মা ছিলেন একদিক থেকে খুব কড়া, দুষ্টামি করলে তিনি আমাকে মারতেন পর্যন্ত; কিন্তু আব্বার দৃঢ় ভৎসর্না সব সময় সংশোধনী হিসেবে বেশী ভালো কাজ করতো। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া আব্বা আমাকে বেশী মেরেছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর কাছে মার খাওয়ার কারণ ছিল সাধারণত চাকর-বাকরদের প্রতি দুর্ব্যবহার (এটা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন) অথবা গ্রীষ্মকালে রোদের মধ্যে খালি পায়ে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানো।

বাড়ির মধ্যে আমাদের চিৎকার বা গোলমাল করতে দেওয়া হতো না। কখনো কখনো আমি যদি অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বাড়ির লনে ক্রিকেট খেলতাম তাহলে তিনি আমাদের বাইরে গিয়ে অন্য কোথাও খেলতে হুকুম দিতেন। কিন্তু আবার অন্যান্য সময়ে তিনিও এসে আমাদের খেলায় যোগ দিতেন। সম্ভবত ঘুড়ি ওড়ানো দেখলে তাঁর নিজের শৈশবের কথা মনে হতো। কাজেই আমি যখন ঘুড়ি ওড়াতাম সে সময় তিনিও ছাদের উপরে এসে আমার হাত থেকে সুতো-লাটাই নিয়ে লেগে পড়তেন।

ছোটবেলায় আমার খুব ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল কিন্তু আব্বা সেটা জানতেন না। যখন তিনি জানতে পেলেন, আমার ছবি আঁকার শখ আছে এবং আমার কয়েকটা শিল্পকর্ম দেখলেন, তখন তিনি আমাকে অত্যন্ত উৎসাহ দিলেন এবং আমার জন্য প্রধান প্রধান ফরাসী, ইতালীয় ও স্পেনীয় শিল্পীদের আঁকা ছবির বড় বড় প্রিন্ট কিনে আনলেন।

সঙ্গীত আমি খুব ভালবাসতাম, কিন্তু আমাদের বাড়িতে গ্রামোফোন বা রেডিও কিছুই ছিল না। আব্বা নিজেও সঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিলেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর সেতার বাজানোর অভ্যাস ছিল। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তাঁর কখনো মরে যায়নি। তাঁর জীবনের শেষের দিকে ফকীর নাজমুদ্দিন নামে তাঁর একজন বন্ধু এসে তাঁকে সেতার বাজিয়ে শোনাতেন। তাছাড়া যখনই আমাদের বাড়িতে কোন গায়ক এসে তাঁকে তাঁর গজল গেয়ে শোনাতেন, তখনই তিনি সে আসরে আমাকেও ডেকে নিতেন।

১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান। যখন আমার বয়স ছিল সাত কি আট। সে সময়ে আমি তাঁকে আমার জন্য একটি গ্রামোফোন কিনে আনার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। সে গ্রামোফোন কখনোই আসেনি, কিন্তু আমার চিঠির জবাবে তিনি এই কবিতাটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন (কবিতাটির শিরোনাম -জাবিদের কাছেঃ তার প্রথম চিঠি পেয়ে):

প্রেমের সাম্রাজ্যে তোমার ঘর বাঁধো;

সময়কে নতুন করে গড়ে নাও,

গড়ে নাও এক নতুন সকাল, এক নতুন সন্ধ্যা!

যদি আল্লাহ তোমাকে প্রকৃতির সৌহার্দ্য দান করেন,

গোলাপ আর টিউলিপের দীর্ঘ নীরবতা থেকে

বুনে নাও তোমার ভাষা।

সস্তা কাঁচের চতুর শিল্পীদের কাছে কোন দান

চেয়োনা!

স্বদেশের নিজস্ব মাটি থেকে গড়ে নাও তোমার

পেয়ালা আর পানাধার।

আমার দ্রাক্ষালতার শিষে আঙ্গুর হচ্ছে আমার গান;

সেই আঙ্গুরগুচ্ছ থেকে পরিশ্রুত করে নাও

পপি ফুলের মতো লাল রঙ-এর সুরা!

আমার পথ তপস্যার না; ভিক্ষুকের ছিন্ন বসনের

মধ্যে প্রকাশিত হোক তোমার ঔজ্জ্বল্য।

বরাবর আম্মার এই দুর্ভাবনা ছিল যে, আব্বা কোন কাজ করতেন না। আমিও ভেবে পেতাম না যে, সত্যিই তিনি কি কাজ করতেন। আব্বা কি কাজ করেন আমাকে কেউ তা জিজ্ঞাসা করলে আমি বিব্রতবোধ করতাম। তাছাড়া আম্মা গভীরভাবে চাইতেন যে, আমাদের একটি নিজস্ব বাড়ি তৈরী করা প্রয়োজন। তখনকার দিনে আমরা ম্যাকলোড রোডে একটি ভাড়াটে বাড়িতে থাকতাম। কয়েক বছর পরে আমার আম্মার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের নতুন বাড়িতে পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (অর্থাৎ নতুন বাড়িতে আসার দু'দিন পরেই) আম্মা ইন্তেকাল করলেন। আম্মার মৃত্যুর সময় আমার বয়স ছিল প্রায় এগারো বছর আর আমার ছোট বোন মুনীরার বয়স ছিল প্রায় পাঁচ বছর।

আম্মার ইন্তেকালের পর মুনীরা ও আমি আব্বার ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্যে এলাম। আমার এখনো মনে পড়ে, আম্মার মৃত্যুতে আমরা দু'জনে গভীরভাবে কেঁদেছিলাম এবং পরস্পর হাত ধরাধরি করে আব্বার কামরায় গিয়েছিলাম। বরাবরের মতো তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন, কারণ সে সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর গলার স্বর বসে গিয়েছিল, ভালোভাবে কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না।

মুনিরা আর আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে যেতে ইশারা করলেন। আমরা তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাদের একজনকে তাঁর ডানে আর একজনকে বামে বসিয়ে নিলেন, তারপর গভীর স্নেহে আমাদের কাঁধে দু'হাত রেখে তিনি আমার দিকে চেয়ে কিছুটা রাগতঃ স্বরেই বললেনঃ 'তোমার তো এভাবে কাঁদা ঠিক নয়। ভুলে যেয়ো না, তুমি একজন পুরুষ মানুষ — আর পুরুষ মানুষ কাঁদে না। তারপরে, সম্ভবত তাঁর জীবনে এ-ই প্রথম তিনি আমাদের দু'জনের কপালে চুমু দিলেন। আম্মার ইন্তেকালের কিছুদিন পরে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে ভূপালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভুপালে আমার বেশীর ভাগ সময় কেটেছে আব্বার সাহচর্য্যে। আমাকে গড়িয়ে-শিখিয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল; টেবিলের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে, ছুরি-কাটার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান। আমি প্রকৃতিগতভাবে লাজুক ছিলাম বলে তিনি আমাকে বারে বারে উপদেশ দিতেন যে, লোকের মধ্যে আমি যেন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে না থেকে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলি।

ফেরার পথে আমরা কয়েকদিন দিল্লীতে থেকে যাই। সেখানে তিনি আমাকে বিশেষ বিশেষ দর্শণীয় জায়গাগুলো ঘুরে ফিরে দেখান। আমরা লালকেল্লা, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার এবং কুতুব মিনার পরিদর্শন করি। আমি তাঁকে আমাকে কুতুব মিনারের উপরে নিয়ে যেতে অনুরোধ করলে আব্বা বললেন যে, তাঁর সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠার ক্ষমতা নেই। অবশ্য তিনি আমাকে উপরে উঠতে অনুমতি দিলেন, বললেনঃ 'তবে অত উঁচুতে উঠে নিচের দিকে তাকিও না, ভয় পাবে।'

কড়া গরমের সময় আব্বা রাত্রে আঙ্গিনায় চৌকি পেতে ঘুমোতেন। তাঁর বিছানার কাছেই আমার বিছানা হতো। সাধারণত রাত্রেই তাঁর ব্যথা উঠতো। কখনো অনেক রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি দেখতাম, তিনি হাঁটুর উপরে মাথা রেখে তাঁর বিছানায় বসে আছেন। যখনি তাঁর প্রেরণা আসতো, তখনই তাঁর মুখের রঙ বদলে যেত এবং তাঁকে দেখে মনে হতো যেন তিনি বিষম শারীরিক অস্বস্তিতে কষ্ট পাচ্ছেন।

প্রায়ই অধিক রাত্রিতে তিনি হাতে তালি বাজিয়ে তাঁর ভৃত্য আলী বখ্‌শকে ডাক দিতেন এবং কলম আর নোট বই আনতে বলতেন। নোটবুকে কবিতা লিখে চলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের ভাব সহজ হয়ে আসতো, যেন তিনি কঠিন বেদনা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন।

অল্পক্ষণ পড়েই তিনি গভীর ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়তেন- যেন তাঁর কিছুই হয়নি।

তাঁর ঘুমোনোর অভ্যাস ছিল ডান কাতে হাত বালিশের নিচে রেখে। কখনো কখনো সেইভাবে শুয়ে তিনি গভীরভাবে ঘুমোতেন তখন খুব জোরে জোরে তাঁর নাক ডাকতো।

অনেক সময় আমি দেখেছি, আব্বা আপন মনেই হাসছেন অথবা বিনা কারণেই কাঁদছেন। একাকি আপন মনে তিনি নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন- তার তালে তালে কখনো তাঁর নির্জীব হাত উপরে উঠতো, আবার সেই ভাবেই নিচে পড়ে যেতো।

ফজরের নামাজ তিনি কখনোই বাদ দিতেন না। আঙ্গিনায় একটা নিচু চৌকির উপরে তাঁর জায়নামাজ পেতে দেওয়া হতো। তাঁর চাল-চলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। নামাজের সময় তিনি একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া পরতেন এবং একটা তোয়ালে মাথায় দিতেন। তাঁর ঘর বইয়ে ভর্তি থাকতো, তাঁর চারধারে ছড়িয়ে থাকতো সেগুলো। বাইরে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না, বরং তাঁর সোফায় বসে বিছানায় শুয়ে পড়াশোনায় তিনি এমন মুগ্ধ হয়ে যেতেন যে, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি-না সেটা ভুলেই যেতেন। হাতের বইটি শেষ করে তারপর মাথা তুলে অত্যন্ত ভাল মানুষের মতো আলী বখ্‌শকে জিজ্ঞাসা করতেনঃ “আচ্ছা, আমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?”

বিকেলে তিনি বাড়ির আঙ্গিনায় পায়চারী করে বেড়াতেন, এ ছাড়া তাঁর আর কোন দৈনিক কাজ-কর্ম ছিল না, এতে তাঁর জীবনকে মনে হতো স্থানু।

আম্মার ইন্তেকালের পর আব্বা তাঁর চুলে কলপ লাগানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। একদিন আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম যে, তাঁর চুলে কলপ দেওয়া দরকার। তিনি হেসে বললেনঃ “আমি এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছি।” জবাবে আমি বললামঃ “আমরা তোমাকে জোয়ান দেখতে চাই, আব্বা!” তিনি আবার তাঁর চুলে কলপ লাগানো শুরু করলেন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই আবার তা ছেড়ে দিলেন, এরপরে আমি আর কখনো তাঁকে শুরু করতে বলবার অবকাশ পাইনি। মুনীরা আর আমি কখনো ঝগড়া করেছি জানলে আব্বা ভীষণ মনোক্ষুণ্ন হতেন। আমাদের পরস্পর মারামারি করা তিনি কখনোই দেখতে পারতেন না। আমি কখনো তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমাকে বলতেনঃ “তোমার দিলটা সত্যিই পাথর! তোমার মনে কি কোন দয়ামায়া নেই? তুমি কি বোঝ না যে, এই দুনিয়ায় ও-ই তোমার একমাত্র বান্ধব? তোমার আম্মা তো মারাই গেছেন, আর আমার সময় আসলে আমিও যাব। তখন ও-ছাড়া তোমার আর কে থাকবে? তুমি যদি ওর সঙ্গে ঝগড়া কর তাহলে তুমি দুনিয়ার সব চাইতে নিঃসঙ্গ মানুষ হবে- আর আমি তোমাকে বলে রাখছি, দুনিয়াতে নিঃসঙ্গ হওয়া খুব সুখের ব্যাপার নয়।”

আব্বা চেয়েছিলেন যে, আমি একজন বড় বাগ্মী হই। তাঁর আরও ইচ্ছা ছিল আমি যেন কুস্তি শিখি; এ জন্য তিনি আমাদের বাড়ির পেছনে আমার জন্য একটা কুস্তি করার জায়গাও তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। ঈদুল আজহার দিনে আমাকে কোরাবানীর জায়গায় উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে বলে দিতেন, যদিও তিনি নিজে রক্তপাত দেখতে পারতেন না।

তাঁর এক বন্ধু ছিলেন সৌদী আরবের লোক। তিনি মাঝে মাঝে আব্বার কাছে আসতেন এবং কখনো কখনো তাকে কুরআনের কিরাত শোনাতেন। আরবটির কণ্ঠ ছিল মধুর। যখনই তিনি কিরাত পড়তেন, তার আগে আব্বা আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছে বসাতেন। একবার আরবটি সূরা “আল-মুজ্জাম্মিল” তিলাওয়াত করার সময় আব্বা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কেরাত শেষ হলে আব্বা মাথা তুলে আমাকে বললেনঃ “আমি চাই তুমি ঠিক এইভাবেই কুরআন তিলাওয়াত করতে শিখবে।”

আর একবার তিনি আমাকে “মুসাদ্দাস-ই-হালী” তিলাওয়াত করতে বলেছিলেন। ঘরে আর যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতে বললেন, সে সব পংক্তির শুরুতে ছিল- “নবীদের মধ্যে যিনি ছিলেন করুণা-স্বরূপ।” দ্বিতীয় পংক্তি আবৃত্তির আগেই আব্বার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো।

আব্বা ইউরোপীয় পোশাক বেশী ভালোবাসতেন না। তিনি আমাকে সব সময়ই আমাদের জাতীয় পোশাক পরতে উপদেশ দিতেন। তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ব্যয়বহুল উপকরণ তিনি পছন্দ করতেন না, বিনা প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করলে আমাকে ভৎর্সনা করতেন। অবশ্য আমি বিছানায় না শুয়ে, মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়েছি শুনলে তিনি খুব খুশি হতেন এবং আমার জন্য গর্ববোধ করতেন। আব্বা আমাকে ইসলামের ইতিহাস থেকে গল্প শোনাতেন। তিনি প্রায়ই খলিফা ওমর (রাঃ) এবং খালিদ বিন ওলিদের গল্প করতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, নেপোলিয়নের পূর্ব-পুরুষরা মূলত আরব থেকে এসেছিল আর তারা ছিল সেইসব আরব যারা ভাস্কো দ্য গামাকে ভারতের পথ

দেখিয়েছিলেন।

একবার (সম্ভবত ১৯৩৭ সালে) কায়েদে আজম আব্বার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি কায়েদের অটোগ্রাফ নেবার জন্য বসবার ঘরে গেলাম। কায়েদে আজম অটোগ্রাফের খাতায় সই দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও কবিতা লিখি কি-না। বললাম, আমি কবিতা লিখি না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ “তাহলে বড় হলে তুমি কি করবে বলে ইচ্ছা করো?” কি জবাব দিতে হবে ঠিক করতে না পেরে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি আব্বার দিকে ফিরে হেসে বললেন, “ও তো কোন জবাব দিচ্ছে না।” আব্বা বললেনঃ “তা ও দেবে না, কারণ আপনি যেদিন বলে দেবেন কি করতে হবে- সে দিনের জন্য ও অপেক্ষা করে আছে।”

শেষ দিকে আব্বার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত কমে গিয়েছিল, কাজেই প্রতিদিন আমি তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতাম। তেমনি প্রতি রাত্রি আমি তাঁকে তাঁর নিজের (অথবা হালীর) কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতাম। আমার কখনো কোন শব্দ উচ্চারণ ভুল হলে তিনি রেগে যেতেন। তাছাড়া আবৃত্তিতে সামান্য মাত্র ভুল হলেও তিনি বিরক্ত হতেন; কর্কশ কণ্ঠে বলতেনঃ “এ কি কবিতা পড়ছো, না গদ্য?”

অবশ্য মুনীরা ছিল তাঁর আদরের। তার ছিল একজন জার্মান গভর্নেস, তাঁকে আমরা “আপাজান” বলতাম। তাঁকে সঙ্গে করে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আব্বার ঘরে কাটিয়ে দিত। আব্বা জার্মান ভাষায় দ্রুত কথা বলতে পারতেন এবং আপাজান-এর সঙ্গে তিনি সাধারণত জার্মান ভাষাতেই কথা বলতেন। তিনি মুনীরাকে জার্মান ভাষা শিখতে বলতেন। তিনি ওকে বলতেন “জার্মান মেয়েরা খুব সাহসী।”

বন্ধু ও ভক্তরা সাধারণত সন্ধ্যায় আব্বার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তার বিছানার চারপাশে চেয়ার পেতে দেওয়া হতো; তিনি “হুক্কা” টানতে টানতে বন্ধুদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে ভালোবাসতেন। রাত্রে তাঁর খাবার অভ্যাস ছিল না, এক বা দুই পেয়ালা কাশ্মীরী চা খেতেন।

আব্বার কাছে যখন লোকজন থাকতো সে সময় আমার সেখানে উপস্থিত থাকার কড়া নির্দেশ ছিল, যদিও বয়স্ক লোকদের কথা-বার্তা শোনা আমার কথা ছিল এক কঠিন শাস্তির মতো। কাজেই সুযোগ পেলেই আমি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম। এতে সাধারণত তিনি খুব আহত বোধ করতেন, বন্ধুদের কাছে তিনি নালিশ জানাতেনঃ “আমি বুঝি না ছেলেটা আমার সঙ্গ এড়াতে চায় কেন।” জীবনের এই পর্যায়ে এসে তিনি একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গ অস্বস্তিতে ভুগতেন। তিনি প্রায়ই বলতেনঃ “সারাটা দিন এখানে পড়ে রয়েছি যেন কোথাকার এক মুসাফির আমি। কেউ আসে না বা আমার কাছে একটু বসে না।”

তাঁর জীবনের শেষ দিনের রাত্রিতে তিনি বসবার ঘরের একটি বিছানায় শুয়েছিলেন; তাঁর চারপাশে বসেছিল তাঁর বন্ধু আর ভক্তরা। রাত প্রায় ন’টার সময় আমি সেই ঘরে ঢুকলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেনঃ “কে?”

“আমি জাবিদ, জবাব দিলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেনঃ “এ কথা কেবল তখনি বিশ্বাস করব যখন তুমি সত্যিই জাবিদ হয়ে উঠবে।” (“জাবিদ অর্থ চিরন্তন”।) তারপর তাঁর অন্যতম বন্ধু চৌধুরী মুহাম্মদ হোসেনের দিকে ফিরে বললেনঃ “চৌধুরী সাহেব, দেখবেন, ও যেন জাবিদনামা’র শেষের প্রার্থনাটি (শিরোনামঃ “জাবিদের উদ্দেশ্যে”) শিখে নেয়।”

সেই রাত্রে বাড়িতে সর্বত্র উদ্বিগ্নভাবে কানাকানি চলতে লাগলো, কারণ ভক্তরা বলেছিলেন আব্বা বাঁচবেন না। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছিল, আর তাঁর অবস্থা হঠাৎ অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ডাক্তারদের অভিমত তাঁর কাছে গোপন রাখা হলেও আব্বা জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও তিনি বেশ উৎফুল্ল এবং সাধারণত যেমন থাকেন তার চেয়ে অনেক বেশী হাস্য-কৌতুকে মগ্ন ছিলেন।

আমাকেও আব্বার অসুখ কতটা গুরুতর সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি; কাজেই আমি আমার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যাইহোক, প্রত্যুষে আলী বখশ আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে চিৎকার করে বলতে লাগলো; “এসো, ওঠ, তোমার আব্বার কি হয়েছে দেখো।”

আমি সত্যিই বিশ্বাস করিনি যে, আব্বা ইন্তেকাল করেছেন। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম কেবল তাঁর কি হয়েছে তা দেখতে। তাঁর

ঘরে যাবার পথে পাশের ঘরে দেখলাম, মুনিরা একাকী একটা ছোট চৌকির উপরে বসে আছে; দুই হাতে মুখ ঢেকে সে অঝোরে কাঁদছে।

আমাকে আব্বার ঘরের দিকে যেতে দেখেই সে প্রায় লাফ দিয়ে এসে আমার হাত ধরে নেতিয়ে পড়লো। হতভাগিনী মেয়েটা তখন চলতে পর্যন্ত পারছিল না, কারণ ওর পা কাঁপছিল।

আমরা আব্বার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। তাঁর ঘরে কেউই নেই। জানালাগুলো সব খোলা। তিনি তাঁর বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে আছেন। একটা সাদা কাপড়ে তাঁর শরীর কাঁধ পর্যন্ত ঢাকা। তাঁর চোখ দুটো বোজা, আর মুখ পশ্চিম দিকে ফেরানো। তাঁর গোফ সম্পূর্ণ ধূসর হয়ে গিয়েছিল। তবে কয়েক মাস আগে আমার অনুরোধে তিনি শেষবার যে কলপ লাগিয়েছিলেন তার ফিকে হয়ে যাওয়া কালো রং-এর রেশ তখনো তাঁর মাথার চুলের আগায় লেগে রয়েছিল।

ভয়ে মুনীরার পা কাঁপছিল। সে তখনো আমার হাত চেপে ধরে রয়েছিল; আমি ওর ফোঁপানি আর কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি কাঁদতে পারলাম না। আমার ভয় হচ্ছিল আমি যদি কাঁদি, আব্বা হয়তো হঠাৎ উঠে পড়বেন এবং আমাদের কাছে যেতে বলবেন, তারপর আমরা তাঁর নিকটে গেলে তিনি আমাদের দু□জনকে তাঁর ডানে আর বামে বসিয়ে নিয়ে স্নেহভরে তাঁর হাত দুটো আমাদের কাঁধের উপরে রেখে হয়তো আমার দিকে চেয়ে রাগতঃ ভাবেই বলবেনঃ □তোমার তো এভাবে কাঁদা ঠিক নয়। ভুলে যেয়ো না, তুমি পুরুষ মানুষ। আর পুরুষ মানুষ কাঁদে না।□

[পাকিস্তান এ্যানুয়াল□, ১৯৬১ সংখ্যা থেকে মাফরুহা চৌধুরী অনূদিত।]

সূত্রঃ আল্লামা ইকবাল সংসদ সম্পাদিত □ইকবাল মানস□ গ্রন্থ

জাবিদ ইকবাল

[illegible] (□□□□-□□□□) [illegible]

[illegible] 1. Ideology of Pakistan (1959) 2. Stray Reflections: A Note-Book of Iqbal (1961) 3. Legacy of Quaid-e-Azam (1968, published in English and Urdu) 4. Mai Lala Faam (1968, collection of papers on Iqbal, in Urdu) 5. Zinda Rood (1984, biography of Iqbal in three volumes, in Urdu) 6. Afkare-Iqbal (1994, interpretation of Iqbal's thought) 7. Pakistan and the Islamic Liberal Movement (1994). 8. Jahan-I Javed : darame, Afsane, Maqale 9. Islam and Pakistan's Identity 10. The Concept of State in Islam : A Reassessment 11. Apna Greban Chaak, (autobiography)